ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1514-1519
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

ভারতীয় সঙ্গীতে খেয়াল গীত-রীতির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ: একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুপর্ণা পতি, *শিক্ষক, সঙ্গীত বিভাগ, ভট্টের কলেজ দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 20.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Humans are the greatest creature in the living world of the Universe. They are the eternal worshippers of *Satya, Shiva and Sundara* (truth, goodness and beauty). This adoration gives rise to the *Charu Shilpa* (fine arts) and *Lalit Kala Vidya* (creative arts). Music is one of the most important of all creative arts as well as performing arts. Through this, men can express their thoughts and feelings, their languages, their inner happiness, their sorrows and sufferings etc. In the context of music, the core principles are listening, contemplation, reflection, practice, discipline and experience. Various types of music are performed in Indian culture through many changes over the ages. A variety of musical forms and variations has seen in political, socio-cultural and religious ups and downs of the country, originating different styles of music. One of the most beloved styles among them is ***'Khayal'***. The word *khayal* is originally an Arabic word. Its pronunciation in Arabic is something like this -'*kh'yal*. The meaning of the word *khayal* in Bengali is imagination, thought, cogitation, impulse, affinity etc. Generally, when we talk about *khayal* song, we think of a style that's imaginative and largely dependent on the performer's individual interpretation and discretion. Music maestros of that time sang Dhrupad songs basically. When the *khayal* songs started to become popular, Dhrupad singers mocked them by telling *khayal gaiye* (khayal singer). This particular musical style is called *khayal* because of its imaginative nature in terms of both content and application. Unlike Dhrupad, khayal does not have such a firm structure of raga. It offers the artist more freedom. Krishnadhan Bandopadhyay in his *'Gitsutrasar'*, defined the meaning of the term *khayal* as *jothechhachar* (arbitrariness). However, regardless of the exact meaning of the term *khayal*, there is no disagreement that *khayal* is the subsequent form of Dhrupad. No style of music came into being all of a sudden, in a single day. Behind it lies a clear imprint of the gradual evolution of a rich cultural tradition. Writing the history of music is not an easy task because there are so many aspects involved in music that is impossible to write an accurate history of any type or style of music without a profound knowledge of it. Writing a history of any subject requires a thorough knowledge of the political, social, cultural and religious ups and downs of the country, in addition to the subject itself. This is very important in music also. Much of our country's history of music have been shrouded in hearsay. In many cases, historical stories have been built upon hearsay and many images have been depicted on the page of history. These are now considered as historical materials. Ancient texts on music and foreign historians, while writing the history of the rise and fall of contemporary

kings and emperors, have documented the identity of society, literature, painting, and music. From these musical treatises and historical accounts, a clear and vivid understanding of the evolutionary progression of *khayal*, from its origin to its development, can be traced.

Keywords: khayal, Music, Raga, Imagination, Evolution

ভারতীয় সংস্কৃতিতে সঙ্গীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ধারাবাহিক ভাবে বিকশিত হয়েছে - আবির্ভাব হয়েছে নানা সঙ্গীত শৈলীর। এর মধ্যে একটি সর্বাধিক প্রিয় শৈলী বা গীত-রীতি হল '**খেয়াল**'। *খেয়াল* শব্দটি পারসি ভাষা থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে- *খেয়াল* শব্দটি আরবি শব্দ। বাংলায় *খেয়াল* শব্দের অর্থ- কল্পনা, চিন্তা, ভাবনা, ঝোঁক প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে খেয়াল গান হল- যা একান্তই কল্পনাত্মক ও গায়কের মর্জির উপর নির্ভরশীল। একজন গায়ক যখন তাঁর কল্পনাকে- স্বর, লয়, তান ইত্যাদির মাধ্যমে সাঙ্গীতিক আকার দেন তখনই সৃষ্টি হয় এই *খেয়াল গান*৷ প্রসিদ্ধ সুফী সন্তদের দ্বারা রচিত হয়েছে এই খেয়াল গীত। কল্পনাই হল খেয়াল গীত-রীতির প্রাণ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একটা বাঁধানো কাঠামোর মধ্যে বিশেষ রীতিতে গাওয়া হয়, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া এর চর্চা অসম্ভব। তবে এরই পাশে বিভিন্ন রাজ্যে নিজস্ব ধারায় দেশি সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে। আবার এই দেশি সঙ্গীত ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তির উপরে নতুন রূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে খেয়াল গীত সৃষ্টি হয়েছে। রাগের কাঠামো বাদ দিলে অন্যান্য গীত-রীতি অপেক্ষা এতে দৃঢ় বন্ধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তারল্যই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তান, বিস্তার প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যে অলঙ্কৃত এই গান। তান, রাগ বিস্তার এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে খেয়াল গায়কেরা স্বাধীনতা অনেক বেশি পেয়ে থাকেন। খেয়াল গান প্রধানতঃ দুই প্রকার - *বিলম্বিত খেয়াল* ও *দ্রুত খেয়াল*৷ এদের বড় খেয়াল ও ছোট খেয়ালও বলা হয়। সময়ের দিক দিয়ে দেখলে প্রথমে এসেছে ছোট খেয়াল এবং তারপরে এসেছে বড় খেয়াল। বিলম্বিত বা বড় খেয়ালের সাথে দ্রুত বা ছোট খেয়ালের তফাৎটা হল মূলতঃ লয়ের।

খেয়ালের উৎপত্তি ও উদ্ভাবক নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট মতবিরোধ। খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মতবাদ হল- আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত '**কৈবাড়**'[১] নামক প্রবন্ধ থেকে খেয়াল উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমত এই যে- খেয়ালের উৎস হল একতালী এবং রাসক প্রবন্ধ। আবার কেউ কেউ বলেছেন সঙ্গীত শাস্ত্রকার শার্ঙ্গদেব তাঁর '**সঙ্গীত রত্নাকর**' গ্রন্থে যে শাস্ত্রীয় আক্ষিপ্তিকার[২] বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি। এছাড়া আরও একটি প্রচলিত মত হল- সুরেলা শব্দ-গঠন এবং অলঙ্করণ প্রবণতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে।

এই বিভিন্ন মতের মধ্যে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতটি সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা হচ্ছে- **কাওয়ালী** বা **কাব্বালী**[৩] গানের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে। এই মত যাঁরা পোষণ করেছেন তাঁরা বলেছেন - সুলতান আলাউদ্দিন এবং আমির খসরুর সময়ের পূর্বে উত্তর ভারতে কাওয়াল বা কাব্বাল নামক একদল যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় ছিল। এরা *কাব্বালী* বা *কাওয়ালী* নামক প্রেম-ভক্তিমূলক আঞ্চলিক গীত গাইতেন। এই কাওয়ালী থেকেই '**খেয়াল**' সৃষ্টি হয়। খেয়াল অন্যান্য গীত শৈলীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন রীতির গান হলেও অনেকে মনে করেন এটা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি। এই ধরনের গান প্রথমে কাওয়ালদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কাওয়ালরা *কাব্বালী* বা *কাওয়ালী* নামে দ্রুত লয়ে আঞ্চলিক গীতি গাইতেন। মুসলিম ধর্মে *'কাব্বালী'* শব্দের অর্থ রহস্যময় গান। আমীর খসরু *কাওয়ালী* বা *কাব্বালী* সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন তাই তিনি এই ধরনের গানের দক্ষতা অর্জন করে প্রচুর গানও রচনা করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শার্ঙ্গদেবের ***'সঙ্গীত রত্নাকর'*** প্রকাশিত হয়। আমীর খসরুর সময়কালও এই ত্রয়োদশ শতাব্দী। খসরু সংস্কৃত ভাষা জানার দরুন *'সঙ্গীত রত্নাকর'*-এ যে সাধারনী রাগ-গীতি এবং রূপকালপ্তি প্রভৃতি গানের কথা আছে তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। আবার এমনও হতে পারে তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত কাওয়ালী

[১] ড: উৎপলা গোস্বামী, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (দ্বিতীয় খন্ড), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৫।

[২] তদেব, পৃষ্ঠা ১৫।

[৩] প্রভাতকুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৩।

রীতিকেই *'খেয়াল'* নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই বিশেষ গীত-রীতি ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের পথে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের সময় ধ্রুপদের চর্চা ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই সময়ই খেয়ালের প্রচলন দেখা যায় কিন্তু সুলতানদের সভার পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে সে সময় লাভ করে ধ্রুপদ সঙ্গীত।

খেয়াল সম্পর্কে **ক্যাপ্টেন উইলার্ড** বর্ণনা করেছেন-

> "In the Kheyal the subject generally is a love tale, and the person supposed to utter it, a female. The style is extremely graceful, and replete with studied elegance and embellishment."[8]

উইলার্ড-এর এই উক্তি অনুযায়ী বোঝা যায়- সেই সময় একপ্রকার চটুল প্রেম সঙ্গীত (চুটকলা) হিসাবেই খেয়ালের প্রচলন ছিল এবং বিশেষভাবে নারীরা অর্থাৎ নর্তকীরা এই গান গাইতেন। তিনি হুসেন শাহ শর্কী- কেই খেয়াল গানের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উইলার্ড-এর মতানুযায়ী হুসেন শাহ শর্কী যে খেয়ালের প্রবর্তক- সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে এটুকু আলোচনার পর এবার খেয়ালের দুটি শাখা অর্থাৎ *ছোট বা দ্রুত খেয়াল* এবং *বড় বা বিলম্বিত* খেয়াল নিয়ে কিছু বলা যাক- পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী বিলম্বিত লয়ের বিস্তার যুক্ত বড় খেয়াল বা বিলম্বিত খেয়াল আবিষ্কার করেন বলে মনে করা হয়। বড় খেয়ালে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি তুক্ থাকে। এই খেয়ালের মূল বিষয়বস্তু হল- ঈশ্বরস্তুতি, রাজবন্দনা ইত্যাদি। গম্ভীর প্রকৃতির এই গানে ভক্তি, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। খেয়াল গানের বিভিন্ন অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট গায়ন শৈলীকে **'ফিকরাবন্দ'** বলা হয়। এই *ফিকরাবন্দ*- ই খেয়াল গানকে ধ্রুপদের গায়ন ভঙ্গি থেকে পৃথক করেছে। রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে মীড়, গমক, গিটকিরী, কন্ প্রভৃতি সহযোগে আলাপ, বিস্তার, তান, বোলতান, বাঁট সহকারে শিল্পী *খেয়াল* পরিবেশন করে থাকেন। এই গান অত্যন্ত বিলম্বিত গতির গান। একতাল, ত্রিতাল, ঝুমরা, তিলুয়াড়া প্রভৃতি তালে তবলা সহযোগে গাওয়া হয়। খেয়াল গায়কেরা প্রথমে *বিলম্বিত খেয়াল* গাওয়ার পর *দ্রুত খেয়াল* পরিবেশন করেন। ক্যাপ্টেন উইলার্ড-এর মতে *খেয়াল* অথবা *খ্যাল* খয়রাবাদ জেলায় প্রচলিত ভাষায় প্রধানত রচিত হয়। জৌনপুর সঙ্গীতের একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং হুসেন শাহ শর্কী সঙ্গীতের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে *দ্রুত খেয়াল বিলম্বিত খেয়ালের* আগেই জায়গা করে নেয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আনুমানিক তেরশো, চৌদ্দশো শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজীর সভাগায়ক আমির খসরু সর্বপ্রথম কাওয়ালী রীতির গানকে কিছুটা মার্জিত রূপে উন্নীত করে দ্রুত খেয়াল বা ছোট খেয়াল প্রবর্তন করে বলে মনে করা হয়। ছোট বা দ্রুত খেয়াল চপল গতির গান। এই রচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি ভাগ থাকে। ছোট খেয়ালের গাম্ভীর্য কম থাকায় ত্রিতাল, একতাল প্রভৃতি তালে তবলা সহযোগে গাওয়া হয়। ছোট খেয়ালে বিস্তারের সুযোগ কম। প্রথমে মধ্যলয় এবং শেষে দ্রুত লয়ে গেয়ে নানারকম ছোট বড় তান, বোলতান, সরগম ইত্যাদি দ্বারা গান শেষ করা হয়। ধ্রুপদের প্রভাব একসময় খুব প্রবল থাকায়, খেয়াল শৈলীর গান কিছু সংখ্যক মানুষের ভালো লাগলেও তা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে উপেক্ষিত ছিল। ধ্রুপদ গানের শিল্পীগণ এই গানকে *জনানা সঙ্গীত* বলে তাচ্ছিল্য করতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান হুসেন শাহ শর্কীর সময় মোটামুটি ভাবে খেয়ালের গোড়াপত্তন হলেও *খেয়াল গান* সম্ভবত জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষ পর্যায় থেকে আভিজাত্য লাভ করতে থাকে এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে এই রীতিটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হিসাবে সম্মানিত হতে থাকে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে লেখা ***'রাগদর্পণ'*** গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন গীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফকীরুল্লা বলেছেন যে, খেয়াল দু'কলিতে গঠিত। দেশি ভাষায় এই গান গাওয়া হয়। সম্রাট আকবরের সময় এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। আকবরের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও খেয়াল কিন্তু তখনও রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। বিভিন্ন মতের নিরিখে এটাই মনে করা হয় যে, হুসেন শাহ শর্কীর

[8] ড: স্বপন নস্কর, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খন্ড), আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০০৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৫৫।

আমলেও প্রকৃত খেয়াল সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যায়- জৌনপুর ছিল সঙ্গীত কলার অন্যতম কেন্দ্রস্থান এবং হুসেন শাহ শর্কী যে সঙ্গীতের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জৌনপুরে সঙ্গীতের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত থাকলেও হুসেন শাহ শর্কীর সঙ্গীত চর্চা ব্যাহত হয়নি। তাঁর প্রচেষ্টা খেয়াল গঠনের দিকে এগিয়ে চলছিল। এই সৃষ্টিকর্মে হুসেন শাহ শর্কীর অবদান অনস্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতকের সঙ্গীত গুনী শাহ সদারঙ্গ (নিয়ামৎ খাঁ) খেয়াল গানকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে স্রষ্টা হিসেবে সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের পরেই যাঁর স্থান, তিনি হলেন নিয়ামৎ খাঁ বা সদারঙ্গ। তিনি একজন অতি উচ্চ স্তরের বীণকার তথা ধ্রুপদ ও ধামার গায়ক ছিলেন। সদারঙ্গ খেয়ালের ভাষা, বিষয়বস্তু, গায়কী এবং আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে কলাবন্ত খেয়ালে রূপান্তরিত করেন এবং ধ্রুপদের সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শাহ সদারঙ্গ বুঝেছিলেন- বাদশাহের অনুগ্রহ ছাড়া খেয়াল গান প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। তাই তিনি গানের মধ্যে রাজস্তুতি ও প্রশস্তি ছাড়াও বাদশাহের নাম জুড়ে দিয়ে *'সদারঙ্গীলে মহম্মদ শা'* ভণিতা যোগ করেন। ফলে বাদশাহের অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় খেয়ালের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। খেয়ালের জনপ্রিয়তায় ধ্রুপদ গানের শিল্পীগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। শোনা যায়- শাহ সদারঙ্গ খেয়াল গান প্রচার করলেও নিম্নস্তরের এই গান তিনি কোন দিন গান নি বা তাঁর বংশধরদেরও শিক্ষা দেন নি। পরবর্তীকালীন খেয়াল গায়কগণ হলেন শাহ সদারঙ্গের শিষ্য অথবা শিষ্য বংশীয়।

সদারঙ্গের পর খেয়াল গানের প্রচার এবং প্রসারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন অদারঙ্গ বা ফিরোজ খাঁ। সদারঙ্গ বা নিয়ামৎ খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পুত্র ফিরোজ খাঁ ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরোজ খাঁ মহম্মদ শাহের দরবারে একজন সুগায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ শাহ তাঁকে *অদারঙ্গ* উপাধি প্রদান করেন বলে জানা যায়। ফিরোজ খাঁ বা অদারঙ্গ খেয়াল গাইতেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তিনি যে খেয়াল রচনা করতেন এবং সুর দিতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বহু খেয়াল রচনা করে খেয়াল গানের সম্প্রসারণের পথকে সুগম করে তোলেন। বহু খেয়াল গানে *অদারঙ্গ* নামেরও উল্লেখ রয়েছে। খেয়াল গানে সদারঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অদারঙ্গের নাম সঙ্গীত জগৎ চিরদিন স্মরণ করবে।

খেয়াল গানের জগতে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ- এর সাথে আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল- মনরঙ্গ। মনরঙ্গ অজ্ঞাত পরিচিত এক নাম। তাঁর আসল নাম, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে করা হয়। মনরঙ্গ নামটি সদারঙ্গ, অদারঙ্গ নামের সঙ্গে অনেকটা মিল থাকলেও তিনি সদারঙ্গ বা নিয়ামৎ খাঁ এর বংশের কেউ ছিলেন না। মনে করা হয়, তিনি সদারঙ্গের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভা এবং অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী মনরঙ্গ অতি উচ্চস্তরের ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক ছিলেন। শুধুমাত্র গায়ক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না, স্রষ্টা হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর রচিত ধ্রুপদ ও খেয়াল গান আজও বিভিন্ন সঙ্গীতগুনীর কণ্ঠে শোনা যায়। তিনি তাঁর রচিত গানের ভণিতায় *মনরঙ্গ* কথাটি ব্যবহার করতেন।

তাঁর রচিত একটি খুব জনপ্রিয় খেয়াল যা বৃন্দাবনী সারং রাগে আধারিত, তা হল -

"বন বন ঢুঁড়ন জাউ।
কিত হু ছুপ গয়ে কৃষ্ণ মুরারী
শিষ মুকুট ঔর কানন কুন্ডল বংশীধর
মনরঙ্গ ফিরত গিরধারী"[৫]

মনরঙ্গ ধ্রুপদের ভাব ও খেয়ালের গতি-বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে এক প্রকার নতুন ধরনের সাদ্ রার প্রচলন করেন। বর্তমানে দুই প্রকার সাদ্ রা শৈলির গান শোনা যায়। একটি ধ্রুপদ অঙ্গের এবং অপরটি খেয়াল অঙ্গের। খেয়াল

[৫] ড: স্বপন নস্কর, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খন্ড), আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০০৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৬২।

অঙ্গের সাদ্ রার ভাষা সাধারণতঃ খেয়ালের অনুকরণেই হয় এবং তান, সরগম, বোলতান ইত্যাদি খেয়াল রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। অজ্ঞাতকুলশীল সঙ্গীত সাধক মনরঙ্গ কঠোর সাধনার দ্বারা খেয়ালের মৃদু স্রোতকে খরস্রোতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খেয়াল গানের উন্নতিকল্পে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ-এর সাথে মনরঙ্গ-এর নাম অকুণ্ঠ চিত্তে উচ্চারিত হবে। এছাড়াও প্রসিদ্ধ জয়পুর ঘরানার প্রবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে মনরঙ্গ-এর নাম জড়িত আছে।

শাহ সদারঙ্গ বা নিয়ামত খাঁ নিজে খেয়াল না গেয়ে এবং নিজ বংশের কাউকে খেয়াল শিক্ষা দান না করে, তিনি তাঁর শিষ্যদের দ্বারা খেয়াল প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছিলেন- এ বিষয়ে পূর্বেও বলা হয়েছে। তাঁর শিষ্য এবং শিষ্য-বংশীয় সঙ্গীত গুণীগণ খেয়াল গানকে গৌরব ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গোলাম রসুল ছিলেন এমনই একজন কৃতি শিষ্য যিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে পাঞ্জাব মতান্তরে লক্ষ্ণৌতে গোলাম রসুল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাওয়াল ঘরানার বংশধর ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সদারঙ্গ-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন বলে মনে করা হয়। তাঁর সম্বন্ধে সেভাবে কিছু জানা যায় না, তবে তিনি টপ্পা গানের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম নবী শোরী মিঞার পিতা। গোলাম রসুল শাহ সদারঙ্গ-এর কাছে খেয়াল ও ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। তিনি গুরুর নির্দেশে খেয়াল গান বেশি গাইতেন এবং এই গানেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার দরবারে গোলাম রসুল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতি উচ্চ স্তরের এই সঙ্গীত রচয়িতা বহু খেয়াল রচনা করেন যা আজও প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। তবে লেখকের নাম সংযুক্ত না থাকায় তার গানগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়নি। তিনি যেমন একজন উচ্চমানের খেয়াল ও ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন তেমনি সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, তিনি যখন বাড়িতে বসে রেওয়াজ করতেন তখন পাখিরা এসে তাঁর চারপাশে বসে গান শুনত। সদারঙ্গ প্রবর্তিত খেয়ালের প্রচার ও প্রসারে গোলাম রসুলের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি খেয়াল গীত শৈলীতে অপূর্ব মাধুর্যের সঞ্চার করেছিলেন।

কোন গায়ক যখন তাঁর গায়কীতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, রসোপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মৌলিক অবদানের সাক্ষ্য রেখে যান, তখন তাঁর সেই প্রতিভা সঞ্জাত নতুন শৈলীর গায়কী একটি ঘরানায় পর্যবসিত হয়। বংশ ও শিষ্য পরম্পরায় ঘরানার প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গীত শৈলী বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীর পরিবেশনের গুনে নানা বৈশিষ্ট্যে ফুটে ওঠে। গায়ন শৈলীর এই বিভিন্নতার জন্য কেবলমাত্র খেয়ালই নয় ধ্রুপদ ও ঠুমরির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। খেয়াল গানের বিকাশের ধারায় গায়কদের গায়কীর বিভিন্নতা হেতু সৃষ্ট খেয়ালের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘরানা হল- গোয়ালিয়র ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, আল্লাদিয়া ঘরানা, কিরানা ঘরানা, জয়পুর ঘরানা প্রভৃতি।

খেয়ালের উৎপত্তি থেকে ক্রমবিকাশের যে ধারা অর্থাৎ খেয়ালের প্রারম্ভিক রূপ থেকে বর্তমানের যে রূপ তার মধ্যে বেশ কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে বা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। প্রথমতঃ বলা যায়- খেয়ালের উৎপত্তির উৎস এবং সময়কাল নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট মতপার্থক্য। কারও মতে আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত *কৈবাড়* নামক প্রবন্ধ। কেউ আবার বলেন- খেয়ালের উৎস মুখে রয়েছে একতালী এবং রাসক প্রবন্ধ। আবার শার্ঙ্গদেবের *'সঙ্গীত রত্নাকর'* গ্রন্থের শাস্ত্রীয় আক্ষিপ্তিকা থেকে খেয়ালের উৎপত্তি বলেও কেউ কেউ মনে করেন। এই মত গুলিকে যদি সামনে রাখা হয় তবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, আলি, একতালী, রাসক বা আক্ষিপ্তিকা যাই হোক না কেন এগুলি প্রবন্ধ গানেরই অন্তর্গত। তাই মোট কথা হল এই যে- *খেয়াল* গীত শৈলী প্রবন্ধগান থেকেই এসেছে। প্রবন্ধগানের সময়কাল আনুমানিকভাবে খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে ত্রয়োদশ শতক। এবার যাঁরা শার্ঙ্গদেবের *'সঙ্গীত রত্নাকর'* গ্রন্থের আক্ষিপ্তিকা থেকে খেয়ালের উৎপত্তি বলে মনে করেন, সেই মতটি বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায়- শার্ঙ্গদেবের সময়কাল আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক (১২১০খ্রি.) আর প্রবন্ধগানের সময়কাল খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে ত্রয়োদশ শতক।

সুতরাং প্রবন্ধগানের কোনো শাখা থেকে খেয়ালের উৎপত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গীত শাস্ত্রী হওয়ায় প্রবন্ধগানের সাথে তাঁর পরিচয় থাকা স্বাভাবিক এবং ***সঙ্গীত রত্নাকর***-এর 'প্রবন্ধাধ্যায়' নামক অধ্যায়টি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। এই ত্রয়োদশ শতকেরই সঙ্গীতবিদ আমীর খসরুকেও অনেকে খেয়ালের

জনক বলতে চেয়েছেন। এই মত অনুযায়ী কাওয়ালী বা কাব্বালী গানের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে। সুলতান আলাউদ্দিন এবং তাঁর সভাগায়ক আমীর খসরুর সময়ের পূর্বে উত্তর ভারতে কাওয়াল বা কাব্বালী নামক যাযাবর সম্প্রদায় প্রেম ভক্তিমূলক আঞ্চলিক গীত গাইতেন। এই কাওয়ালী গীত থেকেই আমীর খসরু খেয়াল সৃষ্টি করেন বলে মনে করা হয়েছে। আমীর খসরুকে আমরা পাই ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এবং এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শার্ঙ্গদেবের *'সঙ্গীত রত্নাকর'* প্রকাশিত হয়। খসরু সংস্কৃত ভাষা জানতেন। তাই *'সঙ্গীত রত্নাকর'*-এ প্রবন্ধগানের বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর হয়তো পরিচয় ছিল। সম্ভবত তিনি এই বিশেষ রীতিটিকে তাঁর দক্ষতায় আকর্ষণীয় করে তোলেন এবং এই রীতিটি ক্রমশ ক্রমবিকাশের পথে পঞ্চদশ শতাব্দীর শর্কী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এইভাবে নানা প্রচেষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান হুসেন শাহ শর্কীর সময় খেয়ালের গোড়াপত্তন হয়। মোগল বাদশাহের যুগে খেয়াল ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে। আকবরের পরবর্তীকালে ধ্রুপদের বিশুদ্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গেলে খেয়ালের পথ সুগম হয়। সঙ্গীত সম্রাট তানসেন গাইতেন শুদ্ধবাণীর ধ্রুপদ, তার রূপ ছিল- ধীর, স্থির, গম্ভীর। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত চটুল খান্ডার বাণীর ধ্রুপদ এসে খেয়ালের প্রতিপত্তির পথকে প্রশস্ত করে দেয়।

ওস্তাদগণ বাদশাহের মনোরঞ্জন এবং উৎসাহে ধ্রুপদ ছেড়ে খেয়ালের দিকে ঝোঁকেন। এইভাবে খেয়ালের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক প্রচার শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। শাহ সদারঙ্গের প্রচেষ্টাতেই খেয়ালের নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ শাহের সময় খেয়াল গান যে উন্নতি লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, তা শাহ সদারঙ্গেরই প্রচেষ্টার ফল।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ) । শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৪০২, কলকাতা।
২. গোস্বামী, ড. উৎপল। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত (১ম খন্ড) । দীপায়ন, ২০১৫, কলকাতা।
৩. গোস্বামী, ড. উৎপলা। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত (২য় খন্ড) । দীপায়ন, ২০১৫, কলকাতা।
৪. দত্ত, দেবব্রত। সঙ্গীত তত্ত্ব। ব্রতী প্রকাশনী, ২০১৫, কলকাতা।
৫. নস্কর, ড. স্বপন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খন্ড) । আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০০৯, কলকাতা।
৬. রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্র কিশোর। হিন্দুস্তানী সংগীতে তানসেনের স্থান। থীমা, ২০০৬, কলকাতা।
৭. গোস্বামী, প্রভাতকুমার। ভারতীয় সঙ্গীতের কথা। আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১৬, কলকাতা।